

**গবেষণা প্রতিবেদন**

**বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ প্রবণতা-২০২১**

**প্রকাশকাল: ১৮ জুন ২০২১, ঢাকা**

**বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ প্রবণতা-২০২১**

**গবেষণা পর্ষদ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **মনিরা নাজমী জাহান** আহ্বায়ক, রিসার্চ সেল, সিসিএ ফাউন্ডেশনসিনিয়র লেকচারার, আইন বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় |  |  |
| **গবেষণা সহযোগী** **আরিফুল আমির** **অধরা ইমা বড়ুয়া****খান মোহাম্মদ আবু সালেহ** **মো. মেশকাত এ রাব্বানি শ্রেষ্ঠ****সিফাতুন্নেসা হক -** রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টার |  |  |
| **তত্ত্বাবধানে:**  |  |  |
| **কাজী মুস্তাফিজ**সভাপতি, কার্যনির্বাহী কমিটি, সিসিএ ফাউন্ডেশন(সম্পাদক, সাইবারবার্তা.কম)  |  | **এসএম ইমদাদুল হক**সহ-সভাপতি(নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিবাংলা**)** |
| **নুরুন আশরাফী**সাধারণ সম্পাদক (চেয়ারম্যান, মিডিয়া মিক্স কমিউনিকেশনস)**তানজিয়াহ খানম**প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক(কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রকৌশলী) |  | **মো. জাহিদুল ইসলাম**সাংগঠনিক সম্পাদক(প্রধান নির্বাহী, জাদুকর আইটি)**আবদুর রব**অর্থ সম্পাদক(ব্যাবস্থাপক, হজ ও ওমরাহ, হাসেম এয়ার ইন্টারন্যাশনাল) |
| **মো. শহীদুল্লাহ**অফিস সম্পাদক(প্রধান নির্বাহী, কালার এক্সপ্রেস) |  |  |

**গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা:**

তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের সম্মানিতউপদেষ্টাবৃন্দ, অন্যান্য চ্যাম্পিয়ন সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষিরা মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে এ প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ:

**সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএ ফাউন্ডেশন)**

 ৫/২ লালমাটিয়া, ব্লক: এ, ফ্ল্যাট: এ৪ (তৃতীয় তলা), মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ ।

 +৮৮০১৯৫৭৬১৬২৬৩  info@ccabd.org, aidcca@gmail.com  [www.ccabd.org](http://www.ccabd.org)

**বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ প্রবণতা-২০২১**

**১. প্রেক্ষাপট**

করোনার ছোবলে স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ব। নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিত করেই চলছে সুস্থ থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা। এর বাইরে নয় বাংলাদেশও। ডিজিটাল সংযুক্তির মাধ্যমে এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশেও বাধ্য হয়েই লকডাইন দিয়ে নিশ্চিত করতে হচ্ছে নিরাপদ দূরত্ব। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাড়ে ১১ কোটির বেশি মানুষকে সংযুক্ত রেখে সচল রাখা হয়েছে মৌলিক চাহিদা তথা বাসা-অফিস-বাজার, ব্যবসা-বণিজ্য, লেনদেন। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-বিনোদন সব কিছুতেই মহাসড়ক হয়েছে ইন্টারনেট। কিন্তু এই মহাসড়কে দুর্ঘটনাও ঘটছে প্রতিনিয়ত। সড়কের সিগন্যাল সম্পর্কে না জানা বা বোঝার পাশাপাশি দুর্বৃত্তদের মাধ্যমেও দিন দিন এখানে আক্রান্তের সংখ্যাটা বাড়ছে। অনেকেই জেনে এবং না জেনে সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

ক্রমেই ইন্টারনেটে ব্যবহার আসক্তির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। গেমের জন্য ইন্টারনেট ডাটা কিনতে টাকা না পেয়ে গত ২১ মে ২০২১ চাঁদপুরে ১৪ বছর বয়সী কিশোর আত্মহত্যা করেছে। মূলত ইন্টারনেট গেম আসক্তি অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যের (ইয়াবা, হেরোইন, গাঁজা, মদ ইত্যাদি) আসক্তির মতোই। পার্থক্য হচ্ছে এটি আচরণগত আসক্তি, আর অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যের বিষয়টি রাসায়নিক আসক্তি।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ টেলিরেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটি ৬১ লক্ষ ৪০ হাজার। এর মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩০ হাজার জন। নেপলেওনক্যাট অনুযায়ী মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৭৯ লাখ ১২ হাজার।

এই সংখ্যার বৃদ্ধির ইতিবাচক দিকগুলোর সঙ্গে নেতিবাচক দিকগুলোও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই হারটা কেবল ভাবিয়েই তুলছে না, ভবিষ্যত নিয়ে জন্ম দিয়েছে নতুন শঙ্কা। তাই, সবার ডিজিটাল তথ্য সুরক্ষার মাধ্যমে তাদের সাইবার নিরাপত্তা দেয়া এবং অপরাধীদের নিরস্ত রাখতে দেশের প্রচলিত আইনসহ নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করা এখন সময়ের দাবি।

সময়ের এই দাবি মেটাতেই গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি **সুস্থ ও দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজিটাল সংস্কৃতি** গড়ে তুলতে কাজ করছে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএ ফাউন্ডেশন)। জরিপ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সাইবার অপরাধগুলো চিহ্নিতকরণ, এর থেকে পরিত্রাণের উপায়, আগামীতে করণীয় এবং সাইবার সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে একটি প্রতিরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সিসিএ ফাউন্ডেশন।

**২.গবেষণার উদ্দেশ্য**

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রত্যয় বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ছিল ঘরে ঘরে তথ্য-প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের ব্যবহার পৌঁছে দেয়া এবং তথ্য – প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সহজ করা। বর্তমান সময়ে এই সাইবার অপরাধের এবং আক্রান্তদের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ ও এর থেকে পরিত্রাণের সম্ভাব্য উপায় নির্ধারণ করাই ছিল এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো:

২.১) সাইবার অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি চিহ্নিত করা।

২.২) বয়স/ পেশা/ লিঙ্গভেদে অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্টকরণ।

২.৩) ব্যক্তিপর্যায়ে সাইবার অপরাধের ধারণা সুস্পষ্টকরণ।

২.৪) ভুক্তভোগীদের আইনের আশ্রয়, আইনি সহায়তা প্রাপ্তিতে সমস্যা এবং অসন্তুষ্টি চিহ্নিতকরণ।

২.৫) অংশীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ, নীতিমালা প্রণয়নে সাহায্য করা, ইত্যাদি ।

**৩.গবেষণা পদ্ধতি ও ধরণ**

বালিঘড়ি মডেল কাঠামোর ভিত্তিতে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে । সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন **গত প্রায় দুই বছর ধরে** জরিপের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে যারা সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগী তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে এই গবেষণা পরিচালনা ও সম্পন্ন করেছে। এই গবেষণা পরিচালনায় ব্যক্তির পরিচয় অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে। এইবার মোট ১৬৮ জন ভুক্তভোগীকে সরাসরি ১৮টি প্রশ্ন করা হয়। ভুক্তভোগীদের প্রশ্ন করার পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে পরামর্শমূলক পদক্ষেপের বিষয়েও জানতে চাওয়া হয়। ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তাদের কাছ থেকে তাদের বয়স/পেশা, কোন ধরনের অপরাধের শিকার হয়েছেন, কোনো আইনি প্রতিকারের আশ্রয় নিয়েছেন কি না, যদি না নেওয়া হয় তাহলে এর কারণ এবং অভিযোগের পরবর্তী অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় ।

**৪. বিশ্লেষণ কাঠামো**

গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে কিছু নির্দেশকের ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরিপ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো থেকে অপরাধের ধরণ, ভুক্তভোগীদের আইনের আশ্রয় নেওয়া কিংবা না নেওয়া, বয়সের ভিত্তিতে ভুক্তভোগী, জেলাভিত্তিক ভুক্তভোগী, অভিযোগের পর ভুক্তভোগীরা প্রত্যাশিত ফল পেয়েছেন কি না, তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক আইন সম্পর্কে জানেন কি না এবং সাইবার অপরাধের তুলনামূলক পরিসংখ্যান করা হয়েছে।

**৫. ফলাফল**

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের নিয়মিত জরিপ ভিত্তিক এই গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয় মোট ১১টি ট্যাবে। সেখানে সামগ্রিক ফলাফলে দেখা গেছে দেশে চার ধরনের অপরাধের মাত্রা কমেছে। অন্যদিকে ছয় ধরনের অপরাধের মাত্রা বেড়েছে। এছাড়া একটি নতুন ধারার অপরাধের আলামত মিলেছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সাইবার জগতের নানা মাত্রিক বিকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিচিত্ররূপে হাজির হচ্ছে এই ধরনের অপরাধ। আমজনতার মধ্যে এসব অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে । তবে সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার পরেও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর কাছে এই ভুক্তভোগীদের অভিযোগের হার হতাশাজনক। অপরাধের বিশ্লেষণে বোঝা যাচ্ছে, দেশে ‘সাইবার সচেতনতা’ বাড়ানোর পাশাপাশি ‘সাইবার লিটারেসি’ও বাড়াতে হবে।

**৫.১ অপরাধের ধরন**

ব্যক্তি পর্যায়ে ভুক্তভোগীদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ২০১৯-২০২০ সালে দেশে সাইবার অপরাধের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক মাধ্যমসহ অন্যান্য অনলাইন একাউন্ট হ্যাকিং বা তথ্য চুরি। জরিপ থেকে এটিএম কার্ড হ্যাকিংয়ের মতো একটি নতুন অপরাধ শনাক্ত করা হয়, যেটি গতবারের প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত হয়নি । করোনাভাইরাস পরিস্থিতির ফলে অনলাইনে কেনাকাটা বৃদ্ধি পাওয়ায় আগের তুলনায় অধিক মাত্রায় মানুষ অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন ।

এবারের জরিপে সাইবার অপরাধের তুলনামূলক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রথম স্থানে রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য অনলাইন একাউন্ট হ্যাকিংয়ের ঘটনা, যার হার ২৮.৩১ শতাংশ। যেখানে ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে এই হার ছিল ১৫.৩৫ শতাংশ, যা এবারের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ কম ছিল। যদিও ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচারের ঘটনা ছিল ২২.৩৩ শতাংশ, কিন্তু এবার এই সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৬.৩১ শতাংশে।

অপরাধের ধরনে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে অপপ্রচার। অবশ্য আশার কথা, এই অপরাধের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। গতবারের গবেষণায় যেখানে এই অভিযোগ ছিল ২২ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এবার তা কমে হয়েছে ১৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। কিন্তু যৌন হয়রানিমূলক একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি/ভিডিও (পর্ণোগ্রাফি) ব্যবহার করে হয়রানির মাত্রা বেড়েছে। অপরাধের মাত্রাটি আগের ৬ দশমিক ০৫ শতাংশ থেকে বেড়ে এবার হয়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। তবে কমেছে ফটোশপে ভুক্তোভোগীর ছবি বিকৃতি করে হয়রানির ঘটনা। এই অপরাধের হার গতবারের চেয়ে এবার অর্ধেকের নিচে নেমে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৮৫ শতাংশে।

এদিকে অপরাধের মাত্রায় অনলাইনে মেসেজ পাঠিয়ে হুমকি দেয়ার ঘটনা এবার তৃতীয় শীর্ষ অবস্থানে উঠে এসেছে। তবে এই অপরাধের মাত্রা গতবারের প্রতিবেদনের তুলনায় প্রায় তিন শতাংশ কমে নেমে এসেছে ১৪ দশমিক ১৬ শতাংশে, যা গতবার ছিল ১৭.৬৭ শতাংশ।

**৫.২ ভুক্তভোগীদের বয়স:**

জরিপে সাইবার অপরাধের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এদের মধ্যে বেশিরভাগ ভুক্তভোগীর বয়স ১৮-৩০ বছর এবং ভুক্তভোগীদের হার ৮৬.৯০ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ১৮ বছরের কম বয়সী ভুক্তভোগী এবং এই ভুক্তভোগীদের হার ৮.৯৩ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ৩১-৪৫ বছর বয়সের ভুক্তভোগী যাদের হার ২.৯৮ শতাংশ এবং সর্বশেষে অবস্থান করছে ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বের ভুক্তভোগী, যার হার ১.১৯ শতাংশ।

বয়সভিত্তিক পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৮-৩০ বছর এবং ১৮ এর চেয়ে কম বয়সের ভুক্তভোগীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আইডি হ্যাকিং বা তথ্য চুরির মতো সাইবার অপরাধের শিকার হয়েছেন বেশি ।

**৫.৩ জেন্ডারভিত্তিক অপরাধ:**

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পরিলক্ষিত হয়েছে, নারী এবং পুরুষের মধ্যে সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হওয়ার মাত্রায় ভিন্নতা রয়েছে। পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি সাইবার অপরাধের শিকার হয়েছেন। সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগীদের জেন্ডারভিত্তিক পার্থক্য করলে দেখা যায়, ভুক্তভোগীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪৩.৪৫% এবং নারীদের সংখ্যা ৫৬.৫৫%। এছাড়াও পুরুষদের তুলনায় নারীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হয়রানি এবং পর্নোগ্রাফির শিকার বেশি হয়েছেন। অন্যদিকে নারীদের তুলনায় পুরুষরা মোবাইল ব্যাংকিং/এটিএম কার্ড হ্যাকিং এবং অনলাইনে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারণার শিকার বেশি হয়েছেন ।

**৫.৪ এলাকাভিত্তিক ভুক্তভোগী**

এলাকাভিত্তিক ভুক্তভোগী তথ্যটি এই বছরের জরিপের নতুন সংযোজন । জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগী ঢাকা বিভাগে, যার মাত্রা ৫৫.৯৫% এবং সর্বনিম্ন সিলেট ও বরিশাল যেখানে উভয় বিভাগেই ভুক্তভোগীর মাত্রা ২.৩৮%। এছাড়া জেলা অনুযায়ী সাইবার অপরাধের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ঘটনা বিভাগীয় শহরে ঘটেছে।

**৫.৫ পেশাভিত্তিক ভুক্তভোগী**

গতবারের প্রতিবেদনে (২০১৯) ভুক্তভোগীদের পেশার ভিত্তিতে চিত্রায়িত করা না হলেও এবারের জরিপে ভুক্তভোগীদের পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্বোচ্চ ৬১.৩১% বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, এরপর যথাক্রমে ১৪.৮৮% কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থী, ৮.৩৩% বেসরকারি চাকরিজীবী এবং সর্বনিম্ন ১.১৯% সাংবাদিক সাইবার অপরাধের শিকার ।

**৫.৬ আইনের ধারনা**

তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ভুক্তভোগীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আইন সম্পর্কে জানেন ৬৪.২৯% বাকি ৩৫.৭১% এ বিষয়ক আইন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

২০১৯ সালের প্রতিবেদনে ৩৭% ভুক্তভোগী আইন সম্পর্কে জানতেন বলে উঠে আসে এবং ৬৩% ভুক্তভোগী জানতেন না । এবারের জরিপে ২৭.২৯% ভুক্তভোগী তথ্যপ্রযুক্তি আইন সম্পর্কে গতবারের চেয়ে বেশি জানেন বলে উঠে এসেছে।

বয়সভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৮-৩০ বছরের ভুক্তভোগীরা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আইন সম্পর্কে অন্য বয়সীদের চেয়ে তুলনামূলক বেশি জানেন, তাদের সংখ্যা ৫৮.৩৩%। ৪৫ বছরের বেশি ভুক্তভোগীরা এ বিষয়ক আইন সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানেন, তাদের সংখ্যা ০.৬০%।

এখানে লক্ষণীয় যে, আইন সম্পর্কে বেশি জানার পরেও ১৮-৩০ বছরের ভুক্তভোগীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে আইন সম্পর্কে কম জেনেও ৩১-৪৫ বছরের এবং ৪৫ বছরের বেশি ভুক্তভোগীদের পরিমাণ তুলনামূলক অনেক কম। তাই শুধু আইন সম্পর্কে জানলেই হবে না, সেই সঙ্গে সচেতনতা, নিজের অধিকার, আইনের ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কেও জানতে হবে ।

**৫.৭ আইনের আশ্রয়**

উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৬৮ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে মাত্র ৩৬ জন সমস্যা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে অভিযোগ করেছেন। এটা মোট ভুক্তভোগীর মাত্র ২১.৪৩ শতাংশ।

অভিযোগকারীদের মধ্যে মাত্র ২২.২২ শতাংশ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দারস্ত হয়ে আশানুরূপ ফল পেয়েছেন । ৭২.২২ শতাংশ ভুক্তভোগী অভিযোগের পর প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল পাননি।

**৫.৮ আইনিব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ:**

ভুক্তভোগীদের আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণের মধ্যে ভিন্নতা দেখা গেছে। কিভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে হয় তা না জানার কারণে সর্বোচ্চ ২২.২০% ভুক্তভোগী অভিযোগ করেননি। আইনি ব্যবস্থা নিয়ে উল্টো হয়রানির ভয়ে ২০.২০% এবং বিষয়টিকে গোপন রাখতে ১৮.৩০% ভুক্তভোগী অভিযোগ করেননি । সবচেয়ে কম ১.২০% ভুক্তভোগী অভিযোগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখেননি।

**৫.৯ ভুক্তভোগীদের পরামর্শ**

দেশে সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৬.৪০% ভুক্তভোগী সচেতনতার তৈরির মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং সর্বনিম্ন ০.৩০% নির্যাতিতার নিরাপত্তা নিশ্চিত ও অপরাধীর সহযোগীদেরও আইনের আওতায় আনার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

**৬. পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অংশীজনদের প্রতি ৯ পরামর্শ**

কৃষি প্রধান বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার পথে। এখন সব মানুষের হাতে রয়েছে ফোন। ঘরে ঘরে কম্পিউটার। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ জীবনকে সহজ করে নিয়েছে। বর্তমানের মহামারীর জন্য সব ব্যবসা অনলাইনমুখী হচ্ছে এবং মানুষ আগের থেকেও বেশি অনলাইনভিত্তিক জীবনযাপনকে আপন করে নিচ্ছে। বর্তমানে মানুষের বিনোদন, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সবকিছুই ইন্টারনেটের মাধ্যমে হচ্ছে। এর যেমন সুফল রয়েছে, এর অপব্যবহারের ফলে কুফলও দেখা যায়। অসচেতনতার ফলে মূলত মানুষ সাইবার অপরাধের শিকার হয় বেশি। মানুষকে এর থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন আত্নসুরক্ষা। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আমাদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কিছু পরামর্শ উল্লেখ করা হলো-

**৬.১ স্বায়ত্বশাসিত ‘সাইবার স্কোয়াড’ গঠন**

সার্বিকভাবে সুস্থ সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শুধুমাত্র আইন-আদালত এবং নিরাপত্তা বাহিনী কিংবা যন্ত্রপাতি দিয়ে সম্ভব নয়। এজন্য দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যক্তিপর্যায়ে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সমন্বিতভাবে নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজ করার বিকল্প নেই। অংশীজনরা বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করলেও কার্যকর ফল পাওয়া যাবে না।

এজন্য আমাদের প্রস্তাব যথা শিগগির সাইবার স্পেস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্য ও সেবার সঙ্গে যুক্ত অংশীজনদের নিয়ে একটি সমন্বিত ‘সাইবার স্কোয়াড’ গঠন করা হোক। সাইবার নিরাপত্তায় কারিগরি বিশেষজ্ঞ, সাইবার পুলিশ, সাইবার আইনজীবী, সাইবার সাংবাদিক, সাইবার ব্যবসায়ী, সাইবার চিকিৎসক, সাইবার স্পোর্টস, সাইবার বিনোদন ও স্বেচ্ছাসেবকসহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে গঠন করা হবে এই স্বায়ত্বশাসিত ‘সাইবার স্কোয়াড’। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি জায়গা থেকে এটি পরিচালিত হবে। এটি করা গেলে বিভিন্ন সময় উপযোগী দিকনির্দেশনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির একটি সুস্থ সাইবার জগৎ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এর ফলে নাগরিকরা নৈতিক ও কল্যাণমুখী প্রযুক্তিভিত্তিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবেন।

**৬.২ সচেতনতামূলক প্রচার**

দেশের প্রচলিত আইনসহ সাইবার সুরক্ষার মৌলিক কারিগরি বিষয়গুলো গণমানুষকে জানানোর জন্য বহুমুখী প্রচারকাজ জরুরি। প্রচার মাধ্যমে সবাইকে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা, প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। বর্তমানে অনেকভাবেই মানুষের কাছে সচেতনতার বার্তা পাঠানো যায় যেমন:

**৬.২.১ গণমাধ্যম**

গণমাধ্যমকে সমাজের দর্পণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা শক্তিশালী জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা হয়ে থাকে গণমাধ্যম যেভাবে বলে জনমত সেভাবেই গড়ে ওঠে। সমাজকে সাইবার অপরাধ নিয়ে সচেতন করার জন্য গণমাধ্যমের সহযোগিতা নিতে হবে। সাইবার জগতের ভয়াবহতা, প্রতিকার, প্রতিরোধ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

**৬.২.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**

আজকাল শিশুরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অন্যান্য সাইবার জগতে অবাধে বিচরণ করে। তাদের এই ছোটবেলা থেকেই সাইবার স্পেসের কালো জগৎ সম্পর্কে জানানো শুরু করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে তাদের সচেতন করার বড় ক্ষেত্র। তাদের পাঠ্য বইয়ে সাইবার জগতের ইতিবাচক-নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে হবে। ইন্টারনেট আসক্তি কমাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। কর্মশালায় ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার কুফল নিয়ে আলোচনা, পাঠচক্র আয়োজন হবে। অনলাইন গেমের বিকল্প হিসেবে শারীরিক খেলাধুলা বা পরিবারের সদস্যদের সময় দেয়ার বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

**৬.২.৩ সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ**

প্রচারের জন্য সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি অংশীজনরা যুক্ত হয়ে কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এতে সাধারণ মানুষের কাছে সচেতনতামূলক বার্তা সহজে পৌঁছাবে এবং সুস্থ সাইবার সংস্কৃতি গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

**৬.৩ আইনকে সবার কাছে পোঁছে দেওয়া**

দেশে বিদ্যমান তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আইন দেশের মানুষকে জানাতে হবে। এই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সাইবার অপরাধের শিকার ভুক্তভোগীদের ৩৫.৭১% প্রচলিত আইন সম্পর্কে জানেন না। আইনের ভাষা সাধারণত সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য হয় না । গণমানুষের জন্য আইনের ভাষা সহজ ও সাবলীল করে প্রচার করতে হবে। প্রয়োজনে অতি প্রয়োজনীয় ধারাগুলো ছোট ছোট আর্টিকেল লিখে বা ভিডিও তৈরি করে সাইবার স্পেসে ছড়িয়ে দিতে হবে। একটি নিরাপদ সাইবার স্পেস তৈরির জন্য এটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হতে পারে। যখন মানুষ আইন জানবে-বুঝবে, তখন নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং আইনি ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী হবে। একইসঙ্গে অপরাধ করার আগে আইনের কঠোরতা সম্পর্কেও মানুষ ভাববে এবং অপরাধে জড়ানো থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।

**৬.৪ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি ও আস্থার সংকট দূর করা**

সাইবার অপরাধ তদন্তে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। যেহেতু সাইবার অপরাধের ধরন দ্রুত পরিবর্তনশীল, তাই এই অপরাধ দমনে সারাদেশের থানাগুলোতে সাইবার পুলিশের বিশেষায়িত শাখা স্থাপন করতে হবে। এই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ভুক্তভোগীদের মধ্যে আইনের আশ্রয় নেন মাত্র ২১.৪৩ শতাংশ। এই অল্প সংখ্যক অভিযোগকারীর মধ্যেও আশানুরূপ ফল পাননি ৭২.২২ শতাংশ। হয়রানির ভয়ে আইনিব্যবস্থা নেননি ২০.২০ শতাংশ ভুক্তভোগী । এ চিত্র থেকে বুঝা যায়, মানুষ বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সেবায় সন্তুষ্ট নয়, আস্থার সংকট রয়েছে। তাদের প্রতি জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

**৬.৫ রাজনৈতিক জনশক্তির সঠিক ব্যবহার**

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনশক্তি সুস্থ সাইবার সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রাজনৈতিক নেতারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে নেতৃত্ব দেন। ফলে তারা স্থানীয়ভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে যেকোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে তা ভালোভাবে প্রভাবিত হয়। দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও সততা থাকলে একজন রাজনৈতিক নেতা সেগুলোর সমন্বয়ে জনগণের কল্যাণে সচেষ্ট থাকবেন। পাড়া, মহল্লা ও ইউনিয়নে নবীন-প্রবীণের সমন্বয় করে নেতাকর্মীদের ইন্টারনেটের সুষ্ঠু ব্যবহার ও নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা যেতে পারে। এরপর তারাই সমাজে নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবেন।

**৬.৬ ই-কমার্স নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ**

দেশে দ্রুত বর্ধনশীল ই-কমার্স খাতকে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ইতোমধ্যেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি ই-কমার্স নীতিমালার খসড়া তৈরির খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি ইতিবাচক উদ্যোগ। কিন্তু ইতিপূর্বে একই মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ‘ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা’ মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হলেও এখনো এই খাত সংশ্লিষ্টদের তদারকির জন্য ‘নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ’ হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে কাজ করছে না। তাই অংশীজনদের সমন্বয়ে দ্রুত ই-কমার্স নীতিমালার খসড়াকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা রাখলে এই খাতের উন্নতি অব্যাহত থাকবে। ই-কমার্স নীতিমালায় ‘পণ্য না দেখে টাকা পরিশোধ নয়’ বা ওপেন ডেলিভারি এবং গ্রাহক অসন্তুষ্টির কারণে পণ্য ফেরত দেয়া বাধ্যতামূলকসহ গ্রাহকের স্বার্থ প্রাধান্য দেয়া উচিত। এটি করলে ব্যবসার নামে প্রতারণার হার অনেকাংশেই কমে যাবে এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীরা গ্রাহক সন্তুষ্টির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেবেন।

**৬.৭ পর্নোগ্রাফির আগ্রাসন ও অপসংস্কৃতির রোধ করা**

সাইবার জগতে সংঘটিত অপরাধগুলোর মধ্যে পর্নোগ্রাফি সবচেয়ে ঘৃণিত এবং ভয়াবহ অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের ভয়াল আগ্রাসনে অতিমাত্রায় যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে নারীরা। এই অপসংস্কৃতির চর্চার ফলে বিশেষ করে তরুণসমাজ ক্রমাগত নৈতিক পদস্খলনের পথে। দিন দিন তারা যৌন হয়রানির মতো অপরাধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই বিকৃত মনমানসিকতা এবং অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে তরুণ সমাজকে মুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে এই অপসংস্কৃতির চর্চা নিয়ন্ত্রণ করে দেশীয় সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় তরুণদের উৎসাহিত করতে হবে। একইসঙ্গে আইনের সঠিক প্রয়োগও জরুরি। যৌন নিপীড়নমূলক অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা রোধ করা সম্ভব।

**৬.৮ সাইবার জগতে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা**

সাইবার জগতের হয়রানির শিকার নারী-পুরুষ সবাই হলেও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী-শিশুর বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাই নারী ও শিশুর সঙ্গে ঘটা অপরাধের ধরন বিবেচনায় নিয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে নারী-শিশু সম্পর্কিত সচেতনতার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আলাদা কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। সংক্ষিপ্ত সচেতনতামূলক ভিডিও তৈরি করে ব্যাপকভাবে প্রচার করা গেলে তা ইতিবাচক ফল দেবে। আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং শাস্তির ঘটনাগুলোকেও ব্যাপকভাবে প্রচারে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

**৬.৯ সাইবার নিরাপত্তা খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরি**

সাইবার ওয়ার্ল্ড যেভাবে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে বাংলাদেশেরও সক্ষমতা তৈরিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাইবার নিরাপত্তা খাতে যোগান দিতে কারিগরি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। এজন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে সাইবার নিরাপত্তা প্রকৌশলী তৈরি করতে হবে। বহুমাত্রিক কাজের জন্য পৃথক গবেষণাগার তৈরি করতে হবে, যেখান থেকে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বহিঃবিশ্বে সাইবার নিরাপত্তা খাতে জনশক্তি রাফতানিরও সুযোগ তৈরি হবে।

**৭. পরিসমাপ্তি**

গোটা বিশ্ব এখন তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ প্রত্যয় দেশের আধুনিকায়ন এবং উন্নয়ন পন্থাকেও উজ্জ্বল করার পাশাপাশি সহজ করেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। তবে তথ্যপ্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলো যেভাবে উন্নয়নের দিককে প্রসারিত করেছে, অন্যভাবে এর নেতিবাচক প্রভাবগুলো মানুষের জীবনকে করেছে দুর্বিসহ।

‘সাইবার সুরক্ষিত দেশ গড়ার, সম্মিলিত দায়িত্ব সবার’- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে স্বায়ত্বশাসিত ‘সাইবার স্কোয়াড’ গঠন করে সমন্বিত কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে সুস্থ সাইবার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।